সৃষ্টি হয়। মহিলাদের মধ্যে একটি অংশ এই জীবনধারা ও মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা ঘরের ভিতরে ও বাইরে পুরুষের একাধিপত্যের অবসানের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী জীবন পরিত্যাগ করে ঘরের বাইরের জীবনধারা সম্পর্কে এই শ্রেণীর মহিলারা সোচ্চার হন। বস্তুত মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। তবে একে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শৃঙ্খল থেকে নারীমুক্তি বলা যাবে না। ক্রমশ অধিক সংখ্যায় মহিলা রাজনীতিকরা ও রাজনীতিক কর্মীরা নারীজাতির সামাজিক সীমাবদ্ধতা এবং অসামর্থ্য ও অসুবিধাদি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেন। তারা নারীর যাবতীয় বন্ধনমুক্তির ব্যাপারে সক্রিয় হন। অনেক মহিলাই বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অভিন্ন দৃঢ়তা সহকারে সংগ্রাম করেছেন। দুর্গত ও নির্যাতিত মহিলাদের সাহায্য করার জন্য রাজনীতিক মহিলা সংগঠকরা সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। নারীজাতির সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা সম্যকভাবে অনুধাবন করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে সরলা দেবীচৌধুরাণী থেকে আরম্ভ করে আশালতা সেন পর্যন্ত প্রায় সকল রাজনীতিক মহিলা সংগঠকই সক্রিয় ও সদর্থক ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলার ত' বটেই, বাংলার বাইরের অনেক ভারতীয় মহিলা ব্রিটিশ সরকার ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসামান্য দৃঢ়তা সহকারে সংগ্রামের সামিল হয়েছেন। মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বভাবতই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং পরবর্তীকালে ভারতের গণপরিষদে সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

৭.৭ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী (Liberation Movement and Women)

স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, আদিবাসী আন্দোলন ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট আন্দোলনসমূহে প্রত্যক্ষভাবে মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদি সরাসরি সংযুক্ত থাকে না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আন্দোলনসমূহে সামাজিক এবং শ্রেণী সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। সমাজবিজ্ঞানী গেইল ওমভেদ [Gail Omvedt (1978)] মহিলাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত আন্দোলনকে বলেছেন 'প্রাক্ আন্দোলন'। গেইল তাঁর *Women and Rural Revolt in India* শীর্ষক এক প্রবন্ধে [Journal of Peasant Studies', 5(3) April -এ প্রকাশিত] বলেছেন: "The reveal the power of women as a force in society, they allow women opportunity to begin to bring forward their own needs, and they are often part of a process leading to the development of women's movements as such."

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে দশ জন মহিলা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী আহ্বান জানান। মহিলারা ব্যাপক সংখ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তারফলে জাতীয়তাবাদী নেতাদের ধ্যান-ধারণায় মৌলিক পরিবর্তন আসে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী মহিলাদের আত্মনিবেদনের অধ্যায়টি হল ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমকালীন ভারতের মহিলারা পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য-সহানুভূতি জানানোর মধ্যেই নিজেদের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারতেন। সনাতন ভারতের পুরুষপ্রধান সমাজে নিপীড়িত ও অসহায় নারীজাতির পক্ষে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সে সময়ে ভারতের মহিলারা তা করেননি। সমকালীন ভারতের মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবারের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন। শুধু তাই নয় অনেক মহিলা রাজনীতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ঘনশ্যাম শা তাঁর *Social Moevements in India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Some scholars assert that the freedom movement helped women in their struggle for 'liberation', as femenism and nationalism were closely interlinked."

মহাত্মাগান্ধী ও পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকা || নারী জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সামিল করার ব্যাপারে গান্ধীজী ও নেহরুজীর ভূমিকা সদর্থক ও সক্রিয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন যে, মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে তিনি আপোষহীন ("I am uncompromising in the matter of women's rights.")। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "Woman is the companion of man gifted with equal mental capacities. She has the right to participate in the minutest details of activities of

men and she has the same right to freedom and liberty as he...By sheer force of vicious custom, even the most ignorant and worthless men have been enjoying a superiority over women which they do not deserve....

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নারীধর্মের অন্তর্নিহিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সত্যাগ্রহের ব্যাপারে মহিলাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উপযোগী। কারণ অহিংস আন্দোলনের উপযোগী গুণাবলী মহিলাদের কাছে। কংগ্রেসের গঠনমূলক এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও মহিলাদের ভূমিকা বিশেষভাবে সহায়ক। অহিংস আন্দোলনের জন্য আবশ্যক গুণাবলী নারী জাতির মধ্যেই বিশেষভাবে বর্তমান। এগুলি হল: আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দু:খ-কষ্ট সহকারে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে আন্তরিকতা প্রভৃতি। এই সমস্ত মহান গুণাবলী মহিলাদের মধ্যেই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন পশ্চিমী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এবং উদারমনস্ক। নারী ভোটাধিকারের সমর্থক নেহরু নারী জাতি সম্পর্কিত সকল বিষয়েই পশ্চিমী উদারনীতিক ধ্যান-ধারণার অনুগামী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী জাতির সমানাধিকারের জন্য আর্থনীতিক স্বাধীনতা আবশ্যক। পণ্ডিত নেহরুর অভিমত হল: "If women's struggles remained isolated from the general political, economic and social struggles, the women's movement would not gain strength and will remain confined to the upper classes."

মহিলা সংগঠনসমূহ || মহিলা সংগঠনসমূহের গড়ে উঠার বিষয়টিও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেশকিছু মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছে। মারগারেট কাসিন (Margaret Cousin) নামে এক আইরিশ মহিলা (পরবর্তী কালে ভারতীয়) ১৯১৭ সালে 'মহিলাদের ভারত সংস্থা' (WIA—Women's India Association) গঠন করেন। ১৯২৬ সালে গঠিত হয় 'ভারতীয় মহিলাদের জাতীয় সংসদ' (NCIW—National Council of Indian Women)। ১৯২৭ সালে গঠিত হয় 'মহিলাদের সর্বভারতীয় সম্মেলন' (AIWC–All India Women's Conference)। ১৯৩৪ সালে গুজরাটে জ্যোতি সিং মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের অংশগ্রহণের পন্থা-পদ্ধতি || বিংশ শতাব্দীর কুড়ির এবং তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল অধিকতর সক্রিয়। খাদি বস্ত্র পরিধানের পক্ষে মহিলারা ব্যাপক প্রচার অভিযানের সামিল হন। বিদেশী দ্রব্য-সামগ্রী ও মদের দোকানের সামনে মহিলারা পিকেটিং করেন। বস্তুত বিভিন্ন ভাবে মহিলারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা রাজনীতিক প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেছেন; বিদেশী পণ্যের দোকানের সামনে পিকেটিং করেছেন; স্বদেশী গান গাইতে গাইতে প্রভাতফেরী করেছেন প্রভৃতি। রাজনীতিক চরমপন্থী আত্মগোপনকারী ক্রিয়াকারীদের প্রয়োজনমত খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছেন মহিলারা। ভারতব্যাপী মহিলাদের এই ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে। গান্ধীজীর আহ্বানে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অসংখ্য মহিলা অংশগ্রহণ করেছেন এবং কারাবরণ করেছেন। এ ঘটনা ১৯৩০ সালের। বহু মহিলা বৈপ্লবিক কাজকর্মেরও সামিল হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেন কলকাতার কল্পনা দত্ত ও কমলা দাসগুপ্ত; বাংলার সরলা দেবীচৌধুরানী, পেরিন ডি.এস. ক্যাপটেন ও ভিকাজি কামা; দিল্লির রূপাবর্তী জৈন; পাঞ্জাবের সুশীলাদেবী ও দুর্গাদেবী প্রমুখ। মহিলাদের রানী ঝাঁসি রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন লক্ষ্মী সাহগল। ঝাঁসি রেজিমেন্ট ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর ভারতীয় জাতীয় সৈন্যবাহিনীর অংশবিশেষ।

স্বাধীনতা সংগামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে লোকসভা, রাজ্যসভা, রাজ্য বিধানসভা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। কেউ কেউ রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী বা ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছেন।

বাসন্তীদেবী ও উর্মিলাদেবী || মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করেন ১৯২০ সালে। বাংলায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সহধর্মিণী বাসন্তীদেবীর উপর। বিদেশী দ্রব্যসামগ্রী বয়কট আন্দোলনে এবং স্বদেশী খদ্দরের প্রচার ও প্রসারে বাসন্তীদেবী নেতৃত্ব দেন। ব্রিটিশ সরকার বাসন্তীদেবীকে গ্রেপ্তার করে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখে। তাঁর সঙ্গে সুনীতিদেবী ও উর্মিলাদেবীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে উর্মিলাদেবী ছিলেন বাসন্তীদেবীর ননদ; যাইহোক ইংরেজ সরকার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাঁদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই গ্রেপ্তারের ঘটনা জনমানসে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই গ্রেপ্তারের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মহিলা রাজনীতিকদের গ্রেপ্তারের ঘটনা নারীসমাজে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ;

একটি উন্মাদনা সৃষ্টিকারী দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। এই দৃষ্টান্ত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গতির সঞ্চার করে। চিত্তরঞ্জন দাশ কারারুদ্ধ হলেন। এই সময় ১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হল বাসন্তীদেবীকে। একজন বাঙালী মহিলা রাজনীতিক নেতৃত্বের সামনের সারিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চট্টগ্রামে ১৯২২ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করলেন বাসন্তীদেবী। এই সম্মেলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। কারণ এই সম্মেলনে রেকর্ড সংখ্যক মহিলার সমাগম ঘটেছিল। অনেকের অভিমত অনুযায়ী মহিলাদের এই অভূতপূর্ব সম্মেলন ছিল বাঙালী নারী সমাজে রাজনীতিক জাগরণের পরিচয়বাহী। আবার অনেকে বলেছেন মহিলা রাজনীতিক বাসন্তীদেবীর সভাপতিত্বের আকর্ষণেই এই সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক মহিলার সমাগম ঘটেছিল। বাসন্তীদেবীর সঙ্গে উর্মিলাদেবীও স্বরাজ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বরাজ-আন্দোলনের আদর্শ ও মূলমন্ত্র প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। চরকার বহুল ব্যবহার এবং বিশেষত মহিলাদের মধ্যে চরকাকে জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর উদ্যোগ-আয়োজনের অন্ত ছিল না। ১৯২১ সালে 'নারী কর্ম মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নারী কর্ম মন্দিরের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে তিনি আন্তরিক ছিলেন।

হেমপ্রভা মজুমদার || ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হেমপ্রভা মজমুদার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে পাঁচজন সদস্য ছিলেন। হেমপ্রভা মজুমদার তাঁদের মধ্যে একজন। ১৯২৩ সালে বোম্বাই শহরে স্বরাজ্যপার্টির জেনারেল কাউনসিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে হেমপ্রভা মজুমদারও এই মিটিং-এ যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। 'নারী কর্ম মন্দির' পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উর্মিলাদেবী। উর্মিলাদেবীকে এই কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন হেমপ্রভা মজুমদার। অনতিবিলম্বে নারী কর্ম মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২২ সালে হেমপ্রভা মজুমদারের উদ্যোগে গঠিত হয় 'মহিলা কর্মী সংসদ'। এই কর্মী সংসদের মাধ্যমে মহিলাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করার সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ মহিলা কর্মী সংসদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ছিল দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হল রাজনীতিক ও সামাজিক। ১৯২১ সালে গোয়ালন্দ ও চাঁদপুরে স্টিমার ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটে হেমপ্রভা মজুমদার সক্রিয়ভাবে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি নারায়ণগঞ্জে যান এবং সেখানে তিনি একটি মহিলা সংগঠন গড়ে তোলেন। ইতিহাসবিদ্‌দের অভিমত অনুযায়ী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে দু'জন বিশিষ্ট মহিলা রাজনীতিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দু'জন মহিলা রাজনীতিক হলেন হেমপ্রভা মজুমদার ও সরোজিনী নাইডু। ১৯২৬ সালে সরোজিনী কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এই সময় সরোজিনীর সঙ্গে হেমপ্রভা সর্বপ্রকারে সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী || ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সরোজিনী নাইডু ও হেমপ্রভা মজুমদারের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বাঙালী মহিলা রাজনীতিকের নাম শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণীয়। ইনি হলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। এই মহিলা রাজনীতিকরা ভারতে বিশেষত বাঙলায় ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে সামিল করেছেন। পরিবার-পরিজন থাকা সত্ত্বেও যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হওয়া যায় সে বিষয়ে এই মহিলা রাজনীতিকরা নিজেদের দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। এঁদের আত্মত্যাগ ও উজ্জীবিত ভূমিকা দেশ ও দেশবাসীর কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নারী সমাজে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও মহিলা রাজনীতিকদের বলিষ্ঠ ভূমিকার দ্বারা অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী শিক্ষকতা করতেন সিংহলে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে তিনি 'দেবীচৌধুরাণী' নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২০) এই মহিলা রাজনীতিকই সর্বপ্রথম একটি 'নারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী' গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। মূলত মহিলাদের দ্বারাই কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে।

লীলা রায় ও আশালতা সেন || স্বাধীনতা সংগ্রামের সামিল মহিলাদের মধ্যে লীলা রায়ের নাম করা দরকার। এই বিদুষী মহিলা নারী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় ১৯২৪ সালে 'দীপালি সংঘ' এই নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। লীলা রায়ের একজন একনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। তাঁর নাম রেণুকা সেন। রেণুকা সেন কলকাতায় দীপালি সংঘের একটি শাখা সংগঠন গড়ে তোলেন। তা ছাড়া তিনি ছাত্রীদের থাকার জন্য একটি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। যাইহোক দীপালি সংঘ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লীলা রায়ের মূল লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী আদর্শে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করা।

আশালতা সেন ঢাকায় 'গাণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' গঠন করেন এবং মহিলাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার প্রচারের ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

সন্তোষকুমারী ও প্রভাবতী দেবী || স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক নেত্রী হিসাবে সন্তোষকুমারী গুপ্ত এবং প্রভাবতী দাশগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই ছিলেন সমকালীন শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মহিলা নেত্রী। তারকেশ্বরে ১৯২৩ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সন্তোষকুমারী নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিকভাবে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন। এবং অনতিবিলম্বে তিনি মহিলা শ্রমিক নেত্রী হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সমকালীন আর একজন বিশিষ্ট মহিলা শ্রমিক নেত্রীর নাম হল প্রভাবতী দাশগুপ্ত। প্রভাবতী দেবী 'ধাঙড় মা' নামে বিশেষভাবে পরিচিত। কারণ তিনি ১৯২৮ সালে হাওড়া ও কলকাতায় ধাঙড়দের ধর্মঘট সংগঠিত করেন। আবার ঐ সময় চটকল ধর্মঘট সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও তিনি সাধ্যমত উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন।

আন্দোলনে ছাত্রীদের যোগদান || মহিলাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর মতাদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শে মহিলাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ১৯২৭ সালে 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ' গড়ে তোলা হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর মা প্রভাবতী বসু এই সংগঠনটির সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের সম্পাদিকা ও সহ-সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করেছেন যথাক্রমে লতিকা ঘোষ এবং অরুবালা সেনগুপ্ত। লতিকা ঘোষ ১৯২৮ সালে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীতে বিভিন্ন কলেজের প্রায় দু'শ জন কলেজ ছাত্রী সক্রিয় সদস্যা হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর সভায় বিভিন্ন কলেজের অনেক ছাত্রী এসেছিলেন। এক্ষেত্রে 'ডায়াশেসন'-এর ছাত্রীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে ছাত্রীরা আন্দোলনে যোগ দিতে এগিয়ে এলেন। ভারতীয় তথা বাঙালী মেয়েদের সাবেকি নারীসুলভ রক্ষণশীল জীবনযাত্রার শৃঙ্খলসমূহ আলগা হয়ে যেতে লাগল। ছাত্রীরাই অধিক সংখ্যায় পথসভা সংগঠিত করতে লাগল। চাঁদা সংগ্রহ, প্রচার, ধর্মঘট সংগঠিত করা প্রভৃতি কাজে কলেজের ছাত্রীরা ক্রমশ অধিক সংখ্যায় এগিয়ে আসতে লাগল।

ছাত্রীদের সংগঠন || স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ছাত্রী-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রীদের দুটি সমকালীন সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। এই দুটি সংগঠন হল 'দীপালি সংঘ' এবং 'ছাত্রী সংঘ'। এই দুটি সংগঠনের মধ্যে গভীর যোগাযোগ ছিল। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে ঢাকায় দীপালি সংঘের সৃষ্টি হয়। মহিলাদের এই সংগঠনটির একটি স্বতন্ত্র ছাত্রী-শাখা ছিল। এই ছাত্রী-শাখাটির কর্মসূচী ছিল বহুমুখী। প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সংগঠনটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া মহিলাদের বিবিধ সামাজিক অধিকারের সমর্থনে জনমত সৃষ্টির জন্য এই সংঘ বিতর্ক ও আলোচনাসভার আয়োজন করত। আবার মহিলাদের আত্মরক্ষামূলক বিবিধ কলাকৌশল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও এই সংঘ করত। ১৯২৮ সালে কলকাতায় ছাত্রীদের এ রকম একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি 'ছাত্রী সংঘ' নামে পরিচিত। বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এর সদস্যা হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বেথুন স্কুল ও কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্রী সংঘের সদস্যদের বিভিন্ন শারীরিক শিক্ষা ও আত্মরক্ষামূলক কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। সুরমা মিত্র ছিলেন এই সংঘের সভানেত্রী এবং কল্যাণী ভট্টাচার্য সম্পাদিকা। ছাত্রী সংঘের সদস্যদের থাকার জন্য একটি ছাত্রীনিবাসও ছিল। ছাত্রী সংঘের সদস্যাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন একজন সমকালীন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা। ইনি হলেন দীনেশ মজুমদার।

দীপালি সংঘ ও ছাত্রী সংঘের সদস্যাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন বীণা দাস, কমলা দাসগুপ্তা, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মসূচীতে এঁরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সমকালীন ভারতের এই সমস্ত মহিলা বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড বেশ কিছু তরুণীকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল; স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি ভালবাসায় উজ্জীবিত করেছিল। ভারতব্যাপী গড়ে উঠেছিল স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় মানসিকতার একদল মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীর। প্রমাণিত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নারী-শক্তি পুরুষ-শক্তির তুলনায় হীন নয়।

বিশিষ্ট মহিলা বিপ্লবী রাজনীতিক || স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে বিপ্লবী মহিলা রাজনীতিক ও সক্রিয় কর্মীদের অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদী আচরণ ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার যে বিপাকে পড়েছিল তা কলকাতা পুলিশের সমকালীন কমিশনার ক্লার্ক-এর প্রতিবেদন থেকে প্রতিপন্ন হয়। এই প্রতিবেদনে সমকালীন বেশকিছু মহিলা রাজনীতিকের নাম আছে। এঁদের রাজনীতিক কর্মকাণ্ড ইংরেজ পুলিশ বাহিনী ও সমগ্র সরকারী ব্যবস্থাকে বিহ্বল করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল।

এই সমস্ত স্বনামধন্যা বাঙালী মহিলা বিপ্লবীরা হলেন বাসন্তীদেবী, ঊর্মিলাদেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, সুনীতিদেবী, বীণাপানি দেবী, প্রতিমাদেবী, সুনীতিবালা মিত্র, মোহিনী দাসগুপ্তা, বগলা সোম, সতীদেবী, উমাদেবী, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ। পুলিশ কমিশনার ক্লার্কের প্রতিবেদন অনুযায়ী মহিলা বিপ্লবীদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্ম। এবং মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরা প্রায়শই সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল ও জনসমাবেশ সংগঠিত করতেন। মহিলা রাজনীতিকদের কর্মকাণ্ড ব্রিটিশ সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শহর কলকাতার মত গ্রামাঞ্চলের মহিলারাও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সামিল হয়েছিলেন। মেদিনীপুরের মহিলারা জেলা-শহরের ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলনকে সফল করে তুলেছিলেন।

উপসংহার || পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে অসংখ্য মহিলা অংশগ্রহণ করেছেন এবং অভাবনীয় আত্মত্যাগ করেছেন। এঁদের সকলের নাম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লেখা নেই এবং স্বাভাবিক কারণে তা লিপিবদ্ধ থাকা সম্ভবও ছিল না। বহু মহিলা স্বেচ্ছাসেবী ও বিপ্লবী ব্রিটিশ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। পুরুষ শাসিত পরিবারের মধ্যে অসংখ্য অসামর্থ্যের জালে জড়িয়ে থাকা মহিলারা পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝাণ্ডা ধরে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছেন। মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় মহিলা রাজনীতিকদের কথা বাদ দিলে বাকি সকলে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগ বিফল যায়নি। মহিলাদের জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সমগ্র জাতির পিঠে চেতনার চাবুক চালিয়েছে; জাতির মধ্যে নতুন শক্তি ও উন্মাদনার সঞ্চার করেছে।

৭.৮ স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে নারী (Women in Independent India)

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে নারীজাতির সুদীর্ঘকালের দূরবস্থার অবসান ঘটেছে, এমনি দাবি করা যায় না। পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটেনি এমন নয়। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এবং এমন কি পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেও মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। সমাজজীবনে মহিলাদের অবনমিত অবস্থানের কারণ হিসাবে কতকগুলি বিষয়ের কথা বলা হয়। বলা হয় যে, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা, নিরক্ষরতা, ধর্মীয় নিয়ম-নিষেধ, জাতিগত নিয়ন্ত্রণ, পুরুষের উদাসীনতা এবং নারী-নেতৃত্বের অভাবের কারণে সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থানের উন্নতি ঘটেনি। মহিলাদের জীবনধারার উপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। নারীজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : সামাজিক কাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক ভূমিকা বণ্টন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন শক্তির অবিরাম মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহ হল ঐতিহাসিক, সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক। শ্যামাচরণ দুবে (S.C.Dube) তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : "The manner in which these controls are exercised depend to a great extent on social structure, role allocation, value premises and the rigidity or flexibility of social control. The interplay of historical, economic, social and political forces contribute significantly to the shaping and re-shaping of gender equations."

সমকালীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির মর্যাদাগত অবস্থানের হীনতার জন্য কতকগুলি বিষয়কে সাধারণভাবে দায়ী করা হয়। এই বিষয়গুলি হল : হিন্দু ধর্ম, জাতভেদ ব্যবস্থা, পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, মুসলমান শাসন প্রভৃতি।

সনাতন হিন্দু ধর্মের কতকগুলি বিশেষ মূল্যবোধ বর্তমান। হিন্দুধর্মের মূল্যবোধ এবং বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী পুরুষের অবস্থান নারীর ঊর্ধ্বে। তা ছাড়া সনাতন হিন্দুধর্মীয় নিয়মনীতি অনুসারে নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক ভূমিকা বণ্টিত হয়। অর্থাৎ ধর্মীয় রীতিনীতি মোতাবেক হিন্দু নারী ও পুরুষের মধ্যে ভূমিকাগত পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাতার ভূমিকায় এবং গৃহকর্মে মহিলাদের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়। বিপরীতক্রমে বলা হয় যে, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকা প্রসারিত হবে। শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী সমগ্র জীবনব্যাপী হিন্দু মহিলাদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল জীবন যাপন করতে হয়।

হিন্দু সমাজব্যবস্থায় নারীর অবনমিত অবস্থানের জন্য জাতপাতের ব্যবস্থাকে বহুলাংশে দায়ী করা যায়। জাতগত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী বালিকা বিবাহের কথা বলা হয় এবং বিধবা বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়। আবার প্রয়াত স্বামীর চিতায় সদ্য বিধবার সহমরণের ব্যবস্থার ব্যাপারেও জাতভেদ ব্যবস্থাকে দায়ী করা